# রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর বাংলা গদ্য : একটি সমীক্ষা

**মোহিনী মোহন সরদার**

"হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।
মৃত্যু অন্তরাল ভেদি' দাও তব অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনেৎ দিক্ উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব।"[১]

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু-শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত 'ভারত পথিক রামমোহন রায়' প্রবন্ধ-সংকলন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নিবেদনটুকু জুড়ে দিয়েছেন। রামমোহন রায় তাঁর জীবদ্দশাতেই বিখ্যাত ও বহুল আলোচিত একজন ব্যক্তি ছিলেন। আর তাঁর অবর্তমানে সন্ধানী মনন তাঁকে নব নব রূপে আবিস্কার করেছে, অভিভূত হয়েছে তাঁর মনীষায়; খুঁজে পেয়েছে আধুনিক দেশ গড়ার অনুপ্রেরণা। তাই কবির এই প্রার্থনা সার্থক ও সমীচীন। উল্লেখিত পদ্যাংশের শুরুর দুই চরণে দেখি কবি বলেছেন, রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শত বৎসর পরে তাঁর প্রতি দেশের সকল নমস্কার মিলেছে। তাহলে এর আগে এবং রামমোহন রায়ের সমকালে দেশের সকল মানুষ কি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেননি ? তাঁরা কি তবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা করেছেন ? সে সব কথা হয়তো অল্প-বিস্তর সকলের জানা আছে। এই নিবন্ধে তাঁর বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। কেবল যেটুকু প্রয়োজন তা পরবর্তীতে উল্লেখ করা যাবে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা রামমোহন রায়ের যে দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার ইচ্ছা পোষণ করছি, তা হল তাঁর বাংলা গদ্য রচনা। নিঃসন্দেহে রামমোহন রায় একজন বহুল চর্চিত মনীষী। উনিশ শতকের নবজাগরণের পথিকৃৎ ও 'ভারত-পথিক' হিসাবে তিনি আজও স্বীকৃত। ভারতের ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের পাশাপাশি তিনি বাংলা ভাষা, বাংলা ব্যাকরণ, গদ্যসাহিত্য ও সংগীতের ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর রচনা-সংগ্রহ সহজলভ্য। শুধু তাই নয়, তাঁর একাধিক জীবনীগ্রন্থও পাওয়া যায়।[২] তাঁর জীবনীকে আশ্রয় করে বিজয় বোসের পরিচালনায় 'রাজা রামমোহন রায়' নামে একটি চলচ্চিত্রও প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৬৫ সালে। এই ছায়াছবিতে বসন্ত চৌধুরী, ছায়াদেবী, বাসবী নন্দী, কমল মিত্র, নীতিশ মুখার্জী, অসিত বরণ, তরুণ কুমার প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করেছেন। সিনেমাটি ১৯৬৬ সালে সেরা ভারতীয় ছায়াছবির শিরোপা লাভ করেছিল। বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁকে নিয়ে চর্চা যে চলবে এবং তা যে প্রাসঙ্গিক সে কথা বলাই বাহুল্য। তবু রচনা নিয়ে আলোচনা রচয়িতার পরিচয় ব্যাতীত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই প্রাসঙ্গিকভাবেই এই কিংবদন্তী মানুষটির ব্যক্তিপরিচয় উল্লেখ করতে হয়।

কুসংস্কারের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন সমাজ যখন আত্মকর্তৃত্বে অক্ষম সেই অবকাশে অনিবার্যরূপে সমাজের কপালে জোটে অপরের দাসত্ব। বাংলা তথা ভারতের ক্ষেত্রে তাঁর অন্যথা ঘটেনি। সমাজ যখন নিজেকে কূপমণ্ডূক করে রেখে সনাতনের নামে জড়ত্বকে জীবনে বরণ করে নিয়েছিল, তখন চারিদিকে নেমে এসেছিল অসীম দৈন্য; জ্ঞানের-অন্নের-স্বাস্থ্যের দৈন্যয় সমাজ তখন জেরবার। এরই বীভৎস রূপ হল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সেই দুঃসময়ে, তমশাচ্ছন্ন গভীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার রাধানগরে জন্ম নেন ভারতবর্ষের আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়। তিনি ছিলেন রায় রায়ান রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় স্ত্রী তারিণীদেবীর কনিষ্ঠ পুত্র। বহুকালের বনেদি জমিদার-বংশ-ঐশ্বর্য ও প্রতাপের তুলনা নেই। সে কালের অভিজাত পরিবারের রীতি অনুযায়ী রামমোহন রায় সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষার পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাগ্রহণের জন্য কাশী বা পাটনা গিয়েছিলেন কি না – সে বিতর্কে অবগাহন অনাবশ্যক। তবে তিনি যে সংস্কৃত এবং আরবী-ফার্সি ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর পাঁচজন অভিজাত সন্তানের মতো তাঁর কাছে শিক্ষা কেবল পুথিগত হয়ে থাকে নি, হয়ে উঠেছিল এক জীবন্তসত্তা। উদার হৃদয়, শাণিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মেধা, অসাধারণ প্রতিভা, অসীম দূরদর্শীতা ও বহুমুখী প্রতিভাধর রামমোহন রায়ের সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী মন প্রচলিত নিরর্থক আচার-অনাচার ও মূর্তিপূজাকে নিরবছিন্নভাবে মেনে নিতে পারেন নি। এদিকে তাঁদের পরিবার পরম ভক্ত-বৈষ্ণব। নিত্য সেখানে বিগ্রহপূজা ও সন্ধ্যাহ্নিক; রামমোহন তা মানেন না। এনিয়ে  প্রথমে সংঘাত বাঁধল তাঁর পিতার সঙ্গে। পুত্রের শাণিত যুক্তির কোনো সদুত্তর পিতার কাছে ছিল না তবুও যুগযুগ ধরে চলে আসা ধর্মীয় বিশ্বাসের অবমাননায় পুত্র তাঁর চক্ষুশূল হয়ে গেলেন। মাতা তারিণীদেবীও বিধর্মীপুত্রকে ভালো চোখে দেখতে পারলেন না। সম্ভবত এই পারিবারিক অশান্তির কারণেই তিনি গৃহত্যাগী হয়ে ভ্রমণে বার হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বছর। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, -

> "রামমোহনের তিনটি আনুষ্ঠানিক বিবাহের কথাও আমরা জানিতে পারি। অতি অল্প বয়সে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়, অ্যাডামের একখানি পত্রে প্রকাশ, রামমোহনের বয়স যখন মাত্র ৯ বৎসর, সেই সময় তাঁহার পিতা এক বৎসরেরও কম ব্যবধানে দুই বার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।"[৩]

বছর চারেক পর দেশে ফিরে কিছুকাল পৈতৃক-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন রামমোহন রায়। এই সময়ও ধর্মবিশ্বাস জনিত কারণে, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে নিত্য নৈমিত্তিক অশান্তিতে হাঁপিয়ে উঠেছিল তাঁর মন। তাই তিনি নিজেই নিজের ভাগ্যকে গড়ে তুলবেন এই সংকল্প নিয়ে ঘর ছেড়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন। কিছুকাল পশ্চিমের নানা স্থান ঘুরে বেড়ালেন, পরে, পাটনা, কাশী ইত্যাদি আরো বহু জনপদ ঘুরে দেখলেন এবং বলাই বাহুল্য যে, এই ভ্রমণে তিনি ভারতবর্ষকে আরো ভালোভাবে দেখার অবকাশ পেলেন; নানান অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। ভ্রমণকালে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রে দৈন্য-দুর্ভাগ্য-কুসংস্কার ও অন্ধতা দেখে তাঁর মন

আলোড়িত হল। সেই আলোড়নের প্রভাবে তমসাবৃত যুগে বসেও তিনি মানবমুক্তির স্বপ্ন দেখলেন। 'Man is born free' এই সত্য আবিষ্কার করলেন।

কেবল চিন্তার দিক নয়, তাঁর উদ্যম ও কর্মতৎপরতাও অবশ্য প্রশংসনীয়। আপন বুদ্ধি আর উদ্যোগের সাহায্যে এই কয়েক বছরে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ১৮০১ সালে রামমোহন রায় কলকাতায় এলেন। শুরু করলেন কোম্পানির কাগজের ব্যবসা। কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালত ও নব্যপ্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। এই সময় কয়েকজন ইংরেজ সিভিলিয়নদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় – এঁদের একজন হলেন জন ডিগ্‌বি। এই সাহেবের সঙ্গে পরিচয় রামমোহন রায়ের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, সে বিষয়ে পরে আসছি। ইত্যবসরে হঠাৎ রায় পরিবারে ভীষণ দুরাবস্থা উপস্থিত হল। কয়েক বৎসরের মধ্যে রামকান্ত রায়ের পরিবার প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে রামকান্ত রায়ের ভুরসুটের ইজারার মেয়াদ শেষ হয় এবং দেখা যায়, তাঁর খাজনার কিস্তি বাকি আছে। এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে গভর্মেন্ট বকেয়া খাজনার জন্য তাঁকে হুগলীর দেওয়ানী জেলে আটক রাখলেন। পরের বছর অক্টোবর মাসে তিনি মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু বর্ধমানের রাজার প্রাপ্য খাজনা পরিশোধ না করায় দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হলেন। অন্যদিকে রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন রায় গভর্মেন্টের খাজনা বাকির দায়ে মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেলে বন্দী হলেন। তবে, রায়-পরিবারের এই ভাগ্যবিপর্যয়ের আঁচ রামমোহন রায়ের উপর সেভাবে পড়েনি, কারণ নানা কারণে ইতিপূর্বে পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেকাংশেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আর্থিক দুশ্চিন্তা ও দুর্দশার মধ্যে এই সময় ১৮০৩ সালে বর্ধমানের বাড়িতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। বাবার শ্রাদ্ধের জন্য রামমোহন রায় বাড়ি ফিরলেও ধর্মমত নিয়ে গোলযোগ বাধায় মা তারিণীদেবী তাঁকে পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকার দিলেন না। এই ঘটনায় পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক কার্যত ছিন্ন হয়েছিল। পরবর্তিতে রামমোহনের বিরুদ্ধে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের রুজু করা মামলার কারণে আরো অবনতি ঘটে। তবে রামমোহন রায় নিজ-ব্যয়ে কলকাতায় পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেছিলেন।

জন ডিগ্‌বির সঙ্গে রামমোহন রায়ের পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। রামমোহন তাঁর অধীনে কাজ করতে লাগলেন। ডিগ্‌বির সঙ্গে তিনি রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। কিন্তু ডিগ্‌বির সঙ্গে তাঁর কেবল মনিব-কর্মচারীরই সম্বন্ধ ছিল না। ডিগ্‌বি সাহেব রামমোহনের অসামান্য প্রতিভার বিষয়ে অবগত ছিলেন। ইতিপূর্বে ১৮০৩-১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ মুর্শিদাবাদ অবস্থানকালে রামমোহনের একেশ্বরবাদ-সম্বন্ধীয় আরবী-ফার্সি পুস্তক তুহফাৎ-উল-মুয়াহহিদীন প্রকাশ পেয়েছে। ডিগ্‌বি তাঁকে ইংরেজি শিখবার পরামর্শ দিলেন। দেশে তখন ইংরেজি শেখবার কোনো রেওয়াজ নেই, ডিগ্‌বি সাহেব রামমোহনকে ইংরেজি শেখানোর দায়িত্ব নিলেন। ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ডিগ্‌বির সান্নিধ্যে ছিলেন। কার্য নির্বাহের পাশাপাশি তিনি উত্তমরূপে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি ইংরেজি রচনায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা বোঝা যায় ফ্রেডরিক হ্যামিল্টনের অশিষ্ট আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিন্টোকে লেখা চিঠি থেকে।[৪] রামমোহন

যে ইংরেজের মতোই চমৎকার ইংরেজি বলতে আর লিখতে পারতেন সে কথা ডিগ্‌বি সাহেবও তাঁর 'জরনালে' উল্লেখ করেছেন।

রামমোহন রায়ের চাকরি সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকের বিশ্বাস ১৮০৫-১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দ এই নয় বছর তিনি কোম্পানির চাকরি করতেন। ব্যাপারটা মোটেও তা নয়, এই পর্বে অতি অল্পকালই তিনি কোম্পানির চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। আদতে তিনি ছিলেন ডিগ্‌বি সাহেবের খাস ফারসি মুন্সী। এই কারণে তিনি সাধারণ লোকের কাছে 'ডিগ্‌বির দেওয়ান' বলে পরিচিত ছিলেন। ডিগ্‌বি সাহেব দীর্ঘ ছুটি গ্রহণ করলে রামমোহন কিছুদিনের জন্য ইংরেজের দৌত্যকার্যে ভুটান যাত্রা করেছিলেন। এরপর রামমোহন রায় এজাতীয় কর্ম থেকে অবসর নিলেন।

ইতিমধ্যে চাকরি ও ব্যবসার দ্বারা রামমোহন রায়ের যথেষ্ট আর্থিক সমৃদ্ধি হল। তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতাতে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন। চৌরঙ্গী ও মানিকতলায় তিনি দুটি বাড়ি ক্রয় করেছিলেন। কলকাতায় এসেই রামমোহন তাঁর সমন্বয়ী ধর্মমত প্রচারে প্রয়াসী হলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সহযাত্রীও জুটল অনেক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উল্লেখ থেকে জানা যায় –

> "এঁদের মধ্যে ছিলেন ছাত্রবন্ধু ভারত-প্রেমিক ডেভিড হেয়ার, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকির জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী, তেলিনিপাড়ার জমিদার অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রিশ্চান পাদরি অ্যাডাম, ভূকৈলাসের রাজা কালীশংকর ঘোষাল, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে।"[৫]

প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীনও হতে হয়েছিল, সে কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাবে। এরপর রামমোহন সমমনস্কদের নিয়ে একটি সভা স্থাপন করলেন, তিনি নিজে 'একমেবাদ্বিতীয়ম' অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর মতানুযায়ী এইরূপ ধর্মই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত। যে কথা প্রমাণ করতে প্রকাশ করলেন 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' নামক দুটি অনূদিত গ্রন্থ। চারিদিকে আলোড়ন পড়ে গেল, গেল-গেল রব তুলল রক্ষণশীল আচারনিষ্ঠ হিন্দুসমাজ। এঁদের মধ্যে রাজা গোপীমোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার জয়কৃষ্ণ সিংহ, পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ বিশেষ উল্লেখ্য। বিরোধিতা যত তীব্র হল আরো গতি নিয়ে চলতে লাগল রামমোহনের লেখনী। তিনি একে একে পাঁচটি উপনিষদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করলেন। আসরে নামলেন বিরোধিরাও তাঁরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবসরপ্রাপ্ত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে দিয়ে রচনা করালেন 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'। বিরোধ-বিতর্ক চলতে থাকল লেখনীর মাধ্যমে। প্রকাশ পেল রামমোহন রায়ের একের পর এক লেখনী। এবিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

কেবল ধর্মমত ও তত্ত্ব আলোচনা এবং লেখনী নয় শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে তাঁর ভাবনা ও উদ্যোগ অবিস্মরণীয়। লেখনীর পাশাপাশি সাময়িক পত্র প্রকাশ ও পরিচালনায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। রামমোহন

রায় যে সমস্ত পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেগুলি হল – 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন-ব্রাহ্মন সেবধি' (১৮২১), 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) ও 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' (১৮২২)।[৬]

রামমোহন রায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রবল সমর্থক ছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ প্রশাসনের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদে তিনি 'মিরাৎ-উল-,আখ্‌বার' বন্ধ করে দিয়েছিলেন, জানালেন –

> "আব্রু কে বা-, সদ্ খুন-ই বস্ত্ দিহদ্
> বা-উমেদ্-ই করম্-এ, খাজা, বা-দায়বান
> মা-ফরোশ-'
> অর্থাৎ যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর দামে কেনা হয়েছে কোনো অনুগ্রহের আশায় তাঁকে দারোয়ানের কাছে বিক্রি কোরো না!' সেযুগে এতবড়ো কথা কেবল রামমোহনেরই বলবার শক্তি ছিল।"[৭]

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্করণে রামমোহন রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন এদেশের দৈন্যতা ঘুচিয়ে বুদ্ধির বিকাশের জন্য ইংরেজি শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা। তিনি এদেশে ইংরেজি-শিক্ষা প্রচলনের অনুরোধ জানিয়ে লর্ড আমহার্স্টকে একটি সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন।

এইসময় তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের চিফ-জাস্টিস স্যার এডোয়ার্ড হাইড ঈস্টের উদ্যোগে কলকাতায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। সদল নিয়ে রামমোহন রায় এই উদ্যোগের সমর্থনে ছিলেন বটে কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের আপত্তির কারণে কলেজের পরিকল্পনা যাতে অঙ্কুরে বিনষ্ট না হয় সেই জন্য তিনি স্বেচ্ছায় কলেজের সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন। রামমোহনকে বাদ দিয়েই তাঁর স্বপ্নের রূপায়ণ ঘটেছিল। সে বিদ্যালয় আজও সগৌরবে বিরাজমান। তাঁর বর্তমান নাম – 'প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়'। এরপর রামমোহন নিজেই একটি নতুন স্কুল তৈরি করলেন, এটির নাম 'অ্যাংলো-হিন্দু-কলেজ'। আরো বিদ্যালয়ের দরকার সেই তাগিদে স্কটল্যান্ড থেকে একজন শিক্ষাব্রতীকে আনালেন, তাঁর নাম আলেকজান্ডার ডাফ্। এই ডাফের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় হল আজকের স্কটিশ চার্চ কলেজ। এর পাশাপাশি রামমোহন রায় স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন নিয়েও সচেষ্ট ছিলেন।

দেশের নারীদের অতিশয় দুরাবস্থা নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। নারকীয় সতীদাহপ্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন ও বহুবিবাহপ্রথা তাঁকে অতিশয় পীড়িত করেছিল। তিনি স্বীয়প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভার মাধ্যমে এবং লেখনীর আশ্রয়ে নৃশংস সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র থেকে প্রমাণ উল্লেখ করেন স্বামীর সহিত সহমরণের কোনো বাধ্যবাধকতা শাস্ত্রে নেই। তাঁর ধারাবাহিক আন্দোলন অবশেষে পূর্ণতা পায় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই জঘন্যতম কুসংস্কার নিষিদ্ধ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা ক্ষেপে উঠল, তাঁরা মূলত সতীদাহ রদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার জন্য 'ধর্মসভা' (১৮৩০) নামক একটি সভা স্থাপন করেছিলেন। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শোভাবাজার রাজবাড়ির রাধাকান্ত দেব। এই সভার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন

– মহারাজা গোপীকৃষ্ণ, হরনাথ তর্কভূষণ, দেওয়ান রামকমল সেন, সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রভাবশালী ধণাঢ্য ব্যক্তিরা। তাঁরা সতীদাহ চালু রাখতে বিলেতের প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তদুপলক্ষ্যে বিশ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ হল। তাঁরা সেই টাকা দিয়ে ফ্রান্সিস বেথি নামি একজন ইংরেজ অ্যাটর্নিকে বিলেতের উদ্দেশ্যে রওনা করালেন।

রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভাও সচেষ্ট হল। স্থির হল রামমোহন রায় স্বয়ং যাবেন বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে উপস্থিত থাকতে। সৌভাগ্যবশত তদানীন্তন দিল্লির নামমাত্র বাদশা দ্বিতীয় আকবর কিছু আবেদন নিয়ে ইংল্যান্ডের রাজার কাছে দূত প্রেরণ করবেন। বাদশার দূত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন রামমোহন। বাদশা তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে ইংল্যান্ড যাত্রায় রওনা করালেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'অ্যালবিয়ন' জাহাজে চড়ে রাজা রামমোহন রায় ইউরোপের পথে যাত্রা করলেন। জানা যায় ফ্রান্সিস বেথির জাহাজ ঝড়ে ডুবে গিয়েছিল, বেথি প্রাণে বাঁচলেও প্রিভি-কাউন্সিলে পৌছাতে পারেন নি। জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার হাত থেকে আইনীভাবে মুক্তি পেল ভারতীয় হিন্দু রমণীকুল।

রামমোহন রায় ইংল্যান্ডে গিয়ে প্রথমে বন্ড স্ট্রিটের একটি হোটেলে উঠেছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উপস্থিত হন বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক জেরেমি বেনথাম। ইউরোপের বিদ্বান সমাজ যে রামমোহনকে বিশেষ সমাদর করতেন এঘটনা তাঁরই পরিচয়বাহী। ইংল্যান্ডে তিনি খুবই সমাদৃত হয়েছিলেন। জানা যায় লন্ডন ব্রিজের উদ্বোধন উপলক্ষে রাজা উইলিয়ামের ভোজ-সভায় রামমোহন নিমন্ত্রিত ছিলেন। চারিদিক থেকেই মিলেছিল সম্বর্ধনা আর অভিনন্দন। সমকালে দেশের মানুষ তাঁর গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারলেও ইউরোপ তাঁকে ঠিকই চিনেছিল। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে রামমোহর রায় ফ্রান্সে গেলেন। ফ্রান্স তাঁকে দু-হাত বাড়িয়ে বরণ করল। সোসাইটি এশিয়াটিক অফ প্যারিস তাঁকে সম্মানিত সদস্য করে নিয়ে দুর্লভ মর্যাদা দিল। কয়েকমাস ফ্রান্সে কাটিয়ে তিনি আবার ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন।

ফ্রান্স থেকে ফিরে ব্যাঙ্ক-বিভ্রাট জনিত কারণে রামমোহন দারুণ অর্থকষ্টে পড়লেন, কোম্পানিও এসময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গ দিলো না। ভগ্ন পা, অর্থকষ্ট, দেনার দায়ে তিনি আরো অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হেয়ার-পরিবার তাঁকে অর্থসাহায্য করতে চাইলেও বন্ধুর থেকে ঋণ নিতে তাঁর আত্মসম্মানে বাঁধল। এই সময় ব্রিস্টল থেকে তাঁকে আহ্বান জানালেন গুণগ্রাহী সুহৃদ ডক্টর কার্পেন্টার। এখানে এসে তাঁর অর্থকষ্ট দূরীভূত হল বটে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম আর পদে পদে সংঘাতে বিধ্বস্ত রাজা বুঝি এবার বিশ্রাম চাইছিলেন। যে দেশের জন্য তিনি অভাবনীয় সংগ্রাম করেছেন সেই দেশের মাটিতে নয় ব্রিটেনের ব্রিস্টলে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর এই মহাজীবনের দেহাবসান ঘটে। এর দশবছর পর দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রিস্টলে গিয়ে স্টেপল্টন গ্রোভ থেকে রামমোহন রায়ের দেহাবশেষ সরিয়ে এনে 'আরনেস ভেল' নামে আরেকটি জায়গায় সমাধিস্থ করে গড়ে দেন একটি চমৎকার মন্দির।

একশো নব্বই বছর হতে চলল রাজা রামমোহন রায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আজীবন তিনি মানবিকতার পক্ষে মানবমুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছেন। গোপাল হালদার লিখেছেন –

"রুশোর সময় থেকে মানুষ সম্পর্কে যে যুক্তিবুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে উন্মেষিত হয়েছিল, মানুষের সার্বিক মুক্তির, তাঁর অধিকারের অখণ্ডনীয়তার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা ব্যক্ত হয়েছিল, রামমোহন আপন মানস-প্রক্রিয়ায় সেগুলি আত্মসাৎ করেন। 'Man is born free' – এই সত্য রামমোহনের জীবনাদর্শের সঙ্গে সমন্বিত হওয়ায় তিনি ভারতবর্ষের নবযুগের প্রথম পথিক হিসাবে চিহ্নিত।"[৮]

রামমোহন রায় যে প্রগতিশীল, প্রতিভাধর, উন্নত এবং ঐক্যবদ্ধ দেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তা আজও অধরা রয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ আজকের প্রতিবেশে যুক্তির আলোকে ঐক্য রচনা করতে রামমোহন রায়কে নিয়ে চর্চা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করি।

৩

অধ্যাপক সুকুমার সেনের মন্তব্য উদ্ধৃত করে এই পর্বের আলোচনা শুরু করা যাক – "ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠ্যপুস্তকের বাহিরা বাঙ্গালা গদ্যের ব্যবহার সর্বপ্রথম করিলেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)।"[৯] একথা আমরা জানি যে বাংলা পয়ারের প্রবল লোকপ্রিয়তা ও ব্যবহারে অনায়সতার দরুণ বাংলা গদ্যের প্রচলন অনেকটাই বিলম্বিত। আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহারের রাজার একটি পত্র, নরোত্তম দাসের 'দেহকড়চা', দোম আন্তোনিও রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ', ক্যাথলিক পাদ্রী মনোএল-দা-আসসুম্পসাম এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পরবর্তীতে কোম্পানির আমলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনখানি আইনের বই বাংলা গদ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে Gospel of st. Mathew অংশ মূল গ্রীক থেকে বাংলায় অনূদিত হয়ে 'মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত' নামে প্রকাশ পেয়েছিল। এর পূর্বে অবশ্য হ্যালহেডের ব্যাকরণে বাংলা লিপিতে কিছু বাংলা বাক্যের উল্লেখ ছিল।

ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হলে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার তাগিদ পরিলক্ষিত হয়। এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরির অধীনে এই বিভাগের শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, গোলোকনাথ শর্মা, রামরাম বসু প্রমুখেরা বাংলা গদ্য রচনায় ব্রতী হলেন। এঁদের লেখনীতে ভাষার জড়তা কাটেনি এবং তা ছিল কেবলমাত্র ইংরেজ সিভিলয়নদের জন্য প্রণীত। এসবের বাইরে বাংলা গদ্যভাষাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব রামমোহন রায়ের। বাংলা গদ্যে তিনি যে-সব পুস্তক রচনা করেছিলেন সেগুলি উল্লেখ করা যাক-

**অ) বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫) :** যাগযজ্ঞাদি কর্মে ব্যাপৃত এই ভারতভর্ষে যখন ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম উদ্ভব হয় তখন থেকেই আর্য পন্ডিতদের মধ্যে এই বিষয়ক কর্ম ও জ্ঞান সম্পর্কে বিস্তর বাদবিসম্বাদ সূচিত হয়। প্রাচীন ঋষিরা এই দুই বিষয়ের ব্যাপক বিচার বিশ্লেষণ করেছন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানপক্ষীয়

ছিলেন। তাঁর উপলব্ধি তিনি কতকগুলি সূত্রাকারে রচনা করেছিলেন। এর বহুযুগ পর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য সেই সকল সূত্রের মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপসনার উপদেশ প্রচার করেন। উক্ত সূত্র এবং শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যার সাহায্যে বেদব্যাসের ব্রহ্মবিচার অনুধাবন করা যায়।

রামমোহন রায় এই গ্রন্থদ্বয়ের গৌরব ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করে তা 'বেদান্তগ্রন্থ' নামে বাংলা অনুবাদ মূলের লিপ্যন্তর সহ প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থের তিনটি অংশ-ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও মূলগ্রন্থ। ভূমিকাংশে লেখক গ্রন্থের উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের পাশাপাশি তাঁর একেশ্বরবাদী মতবাদ নিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিগুলি খণ্ডন করেছেন। অনুষ্ঠান অংশে তিনি বাংলা ভাষায় বেদান্ত চর্চার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। মূলগ্রন্থের চারটি অধ্যায় আছে, প্রতিটি অধ্যায় আবার চারটি করে পাদে বিভক্ত। অধ্যায়গুলি হল – সমন্বয়, অবিশ্বাস, সাধন ও ফলাধ্যায়। তাঁর প্রথম গ্রন্থের ভাষা কেমন ছিল একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক –

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ থেকে-

> "অত এবোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ।।১৮।। ব্রহ্ম নির্বিশেষ হয়েন অতএব যেমন জলেতে সূর্য্য থাকেন সেই জলরূপ উপাধি এক সূর্য্যকে নানা করে সেই রূপ ব্রহ্মকে মায়া নানা করিয়া দেখায় বেদেতেও এইরূপ উপমা দিয়াছেন ।।১৮।। অম্বুবদগ্রহণাত্তুন তথাত্বং ।।১৯।। সূর্য্য এবং জল সমূর্ত্তি হয়েন আর ব্রহ্ম অমূর্ত্তি হয়েন অতএব জলাদির ন্যায় ব্রহ্মকে গ্রহণ করা জাইবেক নাই এই নিমিত্ত এই উপমা উপযুক্ত হয় নাই।। এই পূর্বপক্ষ ইহার সমাধান পূর্বসূত্রে কহিতেছেন ।।১৯।।"[১০]

একটি কথা এখানে উল্লেখ্য যে, রামমোহনের গদ্য প্রথম থেকেই সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল গুণ সমন্বিত ছিল।

**আ) বেদান্তসার (১৮১৫) :** এই গ্রন্থে বিভিন্ন উপনিষৎ থেকে নানা বচন উদ্ধৃত করে রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, অপরিমিত, অনির্বচনীয় তাঁর থেকেই সকল জাতির উৎপত্তি। তিনি ভূমা, জ্যোতির জ্যোতি, সর্বময় এবং জীবের অন্তর্যামীরূপে বাস করেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই এজন্যই সংসার বা জগৎ ব্রহ্মময়। তিনিই সমস্ত কিছুর আধার। এই একমেবাদ্বিতীয়ম ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য। যিনি ব্রহ্ম বিনা অন্য দেবতার উপাসনা করেন তিনি অজ্ঞান দেবতাদের পশুমাত্র হন। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট তিনিই ব্রহ্ম হন। শ্রবণ, মনন ও ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এই হল মূলত এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। এর পাশাপাশি রামমোহন বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে বিদ্রুপবাণও নিক্ষেপ করেছেন। একস্থলে তিনি লিখেছেন- "বেদের প্রমাণ, মহর্ষির বিবরণ আচার্য্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধির বিবেচনায় যাঁর শ্রদ্ধা নেই তাঁর নিকট শাস্ত্র যুক্তি ব্যর্থ"[১১]

উপরিউক্ত উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, রামমোহন রায় কর্ম ও জ্ঞান এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উভয়ই স্বীকার করেছিলেন। এখানেই রামমোহনের চিন্তা ও মতবাদের নূতনত্ব। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিষয়টি অনুধাবন করে বলেছেন –

"রামমোহন শংকর-শিষ্য ও অদ্বৈতবাদী হয়েও সংসার বিমুখ হলেন না, এইটিই হল নবমতের বৈশিষ্ট্য। রামমোহন জানতেন অদ্বৈতবাদের ব্রহ্ম নির্গুণ। সেই নির্গুণ নিরাকার, নির্বিকল্প ব্রহ্ম নেতী-ধর্মী। অর্থাৎ ব্রহ্মকে নেতি নেতি অসংখ্যবার বলেও তাঁকে ইতিবাচক করা যায় না। সুতরাং তাঁকে সগুণরূপে উপাসনা করতে হবে। তবে সগুণ ও সাকার প্রতিশব্দবাচক নয়।"[১২]

**ই) পঞ্চোপনিষৎ :** রামমোহন রায় পাঁচটি উপনিষৎ এর অনুবাদ করেছিলেন-

১। তলবকার উপনিষৎ (জুন, ১৮১৬)

২। ঈশোপনিষৎ (জুলাই, ১৮১৬)

৩। কঠোপনিষৎ (আগস্ট, ১৮১৭)

৪। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (নভেম্বর, ১৮১৭)

৫। মুণ্ডকোপনিষৎ (ফেব্রুয়ারী, ১৮১৯)

রামমোহন রায়ের লক্ষ্য ছিল দশটি উপনিষদের অনুবাদ করা কিন্তু তা তিনি করে উঠতে পারেন নি। তিনি উপরি উল্লেখিত মোট পাঁচটি উপনিষদের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য কেবল অনুবাদ মাত্র ছিল না বরং অনূদিত পুস্তক পাঠের মধ্য দিয়ে সাধারণ লোকের মন যাতে ব্রহ্মত্ত্বের দিকে ধাবিত হয় সে বিষয়েও তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এই কারণে তিনি মূল উপনিষদের অনুবাদের পাশাপাশি তার ব্যাখ্যামূলক টিকাটিপ্পনি ও ভূমিকা অংশ সংযোজন করেছেন। এই ভূমিকা অংশে তিনি নিরাকার ঈশ্বর উপাসনার বিষয়ে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদান করেছেন। পাশাপাশি উপনিষদগুলির অনুবাদ নিয়ে প্রতিপক্ষ শিবিরের বীরূপ সমালোচনাকে উপযুক্ত যুক্তির সাহায্যে খণ্ডণ করেছেন।

**ঈ) উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সাথে বিচার (১৮১৬) :** পরম বৈষ্ণব মহামহোপাধ্যায় উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ রামমোহন রায় সংস্কৃতে তিনটি পুস্তক রচনা করেছিলেন যা উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সাথে বিচার শিরোনামে প্রকাশিত।

উৎসবানন্দ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের একত্ব স্বীকার করেও বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছিলেন। রামমোহন রায় শাস্ত্রীয় যুক্তির আধারে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের এই সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠত্বকে খণ্ডন করে বিষ্ণুর পরম ঈশ্বরত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এই গ্রন্থে।

**উ) ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭) :** রামমোহন রায়ের 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' গ্রন্থের বিরোধিতা করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামের একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের পরতে পরতে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়

নামোল্লেখ না করে বিভিন্ন বিশেষণ ও সর্বনামের আশ্রয়ে রামমোহন রায়কে আক্রমণ শানিয়েছিলেন এবং এর পাশাপাশি তিনি সাকার ঈশ্বর অর্থাৎ মূর্তি পূজার সমর্থনে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদান করেছিলেন।

রামমোহন রায় বিরোধী পক্ষের এই উদ্যোগে উচ্ছ্বসিত হয়ে আলোচ্য নিবন্ধে তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকৃত অভিযোগগুলিকে নস্যাৎ করার পাশাপাশি 'বেদান্তচন্দ্রিকা' গ্রন্থটিতে ব্যাসকূট ভাষার প্রয়োগ, সংস্কৃত অন্বয় ও দূরান্বয় প্রভৃতির ব্যবহারহেতু সাধারণ মানুষ যে গ্রন্থটিরব অর্থগ্রহণে অপারগ হবেন সে কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যতীত বিদ্যালঙ্কার ব্যবহৃত শ্লোক ও শাস্ত্রাদির উৎস এবং যা মূলত রামমোহন রায়ের রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছিল তার সূত্র বিদ্যালঙ্কার প্রস্তাবিত 'বেদান্তচন্দ্রিকা' গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে প্রকাশের অনুরোধ করেছেন। এরই সঙ্গে অশালীন শব্দ ও কুযুক্তি ইত্যাদি পরিহারের পরামর্শ দিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেছেন- "ভট্টাচার্য শাস্ত্রালাপে দুর্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না।" বলাবাহুল্য যে 'বেদান্তচন্দ্রিকা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড আর প্রকাশিত হয় নি।

**ঊ) গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮) :** এই নিবন্ধে যে গোস্বামীর সঙ্গে রামমোহন রায় বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তিনি সম্ভবত রামগোপাল শর্মা।[১৩] এখানে গোস্বামীর সাকার উপাসনা, কৃষ্ণকে ব্রহ্মর সাকারীভূত রূপ, বেদব্যাসকে বিষ্ণুর অবতার, পুরাণ ইতিহাসকে বেদ রূপে স্বীকৃতি এবং বেদ ও বেদান্তশাস্ত্রের জ্ঞানে সাধারণ মানুষের অগমতা প্রভৃতি মতবাদ শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গের সাহায্যে রামমোহন রায় খণ্ডন করেছেন। এখানে রামমোহন রায়ের খণ্ডনকৃত একাধিক যুক্তির মধ্যে দুটি যুক্তি উদ্ধার করা হল-

i) "যে বস্তু সাকার সে নিত্য সর্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপ কদাপি হইতে পারে না।"

ii) "বেদ দুর্জ্ঞেয় হইলেও বেদার্থজ্ঞান ব্যাতিরেকে আমাদের ঐহিক পারত্রিক কোন মতে নিস্তার নেই।"[১৪]

এমন যুক্তিজাল বিস্তারের মধ্য দিয়ে গোস্বামী কথিত ভক্তিমার্গকে অস্বীকার করে ব্রহ্মত্ব লাভের উপার রূপে জ্ঞান ও কর্মের কথাতেই রামমোহন রায় জোর দিয়েছিলেন।

**ঋ) সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮) :** সতীদাহ প্রথা সম্পর্কিত এটিই রামমোহন রায়ের প্রথম রচনা। এই পুস্তকে লেখক তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় অভিনব পন্থায় উপস্থাপন করেছেন। কাল্পনিক দুই চরিত্রের তর্ক-বিতর্ক মূলক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তিনি সহমরণের সমর্থক অর্থাৎ প্রবর্তকদের যাবতীয় বক্তব্য ও যুক্তি সুসংহত রূপে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে তাঁর উপলব্ধি ও যুক্তি নিবর্তকের সংলাপে সুন্দর উপস্থাপনা করেছেন। মূল বিতর্কটি এরকম দাঁড়িয়েছে যে প্রবর্তক অঙ্গিরাদি ঋষির বচন উদ্ধৃত করে বলেছেন-

"যে স্ত্রী ভর্তার সহিত পরলোক গমন করে সে মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং স্বামীকুল এই তিন কুলকে পবিত্র করে।"[১৫]

পক্ষান্তরে রামমোহন রায়, নিবর্তক মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ ঋষির বচন উদ্ধৃত করে বলেছেন, তাঁরা বিধবার ব্রহ্মচর্য ধর্মপালনের কথাই বলেছেন। সুতরাং সহমরণ বাধ্যতামূলক নয়। নিবর্তকের সংলাপে উল্লেখ আছে-

> "তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর পরে তাঁহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে তাঁহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া ছুপিয়া রাখ।"[১৬]

অতঃপর নিবর্তক জানিয়েছেন এ কেবল জ্ঞানপূর্বক স্ত্রী হত্যা। প্রবর্তক এই বন্ধনের সমর্থনে পরম্পরার যুক্তি তুলে ধরলে নিবর্তক প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন – কোনো অন্যায় পরম্পরার দোহাই দিয়ে সমর্থন করা উচিত নয়। প্রবর্তক নতুন যুক্তি সাজালেন যে বিধবাস্থায় ব্যভিচারের সম্ভাবনা আছে। নিবর্তক এই যুক্তি অগ্রাহ্য করে বললেন স্বামী জীবিত থাকা অবস্থাতেও অনেক স্ত্রী ব্যভিচারিণী হয়। এভাবে প্রবর্তকের সমস্ত যুক্তি খারিজ হলে প্রবর্তক শেষ পর্যন্ত যেন নিবর্তকের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। এই পুস্তিকার রচনারীতি সেকালের প্রেক্ষিতে যেমন অভিনব ছিল রচনার ভাষাও তেমনই সহজ, সরল এবং সাবলীল ছিল বলাই যায়।

**এ) প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯) :** কাশীনাথ তর্কবাগীশের লেখনির প্রত্যুত্তরে রামমোহন রায় এই পুস্তিকাটি লিখেছিলেন। কাশীনাথ তর্কবাগীশ তাঁর লেখ্য সহমরণের সমর্থনে নতুন কিছু বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, যেমন – স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্মজ্ঞানশূন্য হয়। স্ত্রীজাতির প্রতি তর্কবাগীশের এই কদর্য অভিযোগ রামমোহনকে অতিশয় পীড়িত করেছিল, তিনি লেখনির মারফতে এর সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন। এই পুস্তিকার মধ্যে নারীজাতির প্রতি রামমোহন রায়ের অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক-

> "প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্প বুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্প বুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কি রূপে নিশ্চয় করেন?"[১৭]

এই গ্রন্থের সর্বত্র স্ত্রীজাতির সমর্থনে রামমোহনের সুচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

**ঐ) গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮) :** গায়ত্রীর অর্থজ্ঞানপূর্বক সাধারণ লোক যাতে পরমব্রহ্মোপসনায় প্রবৃত্ত হন সেই জন্য তিনি আলোচ্য পুস্তিকাটি প্রণয়ন করছিলেন।

**ও) আত্মানাত্মবিবেক (১৮১৯) :** শঙ্করাচার্য রচিত এই পুস্তকটি রামমোহন রায় সংস্কৃতসহ বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে আত্মা, অনাত্মা পরিচয় বিধৃত করে জীবমুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**ঔ) কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০) :** উদ্দীষ্ট কবিতাকারের অভিযোগ ছিল যে রামমোহন রায় বেদ ও সূত্রের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করছেন। এই পুস্তকে রামমোহন রায় কবিতাকারের অভিযোগগুলি অস্বীকার করেন।

**ক) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিষয় (১৮২০) :** সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর রচিত পত্রে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার নিয়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। এর প্রতিউত্তরে রামমোহন আলোচ্য নিবন্ধটি প্রকাশ এবং তাঁর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি উপনিষদের ভাষ্য উদ্ধৃত করে জানান যে, ব্রহ্মবিদ্যাতে সকলের অধিকার আছে।

**খ) চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২) :** কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণ করে চারটি প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নগুলির মধ্যে রামমোহন রায়ের প্রতি নিন্দাসূচক ইঙ্গিত ছিল। ওই প্রশ্নগুলির উত্তরে রামমোহন রায় এই পুস্তকটি লিখেছিলেন।

**গ) পথ্যপ্রদান (১৮২৩) :** কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহন রায়কে তীব্র কটাক্ষ করে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর প্রতি উত্তরে রামমোহন রায় 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই গ্রন্থটি তাঁর সর্ববৃহৎ বিচারগ্রন্থ। সব বিচারগ্রন্থের বক্তব্যই এখানে কিছু-কিছু পাওয়া যায়।

**ঘ) প্রার্থনাপত্র (১৮২৩) :** এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় রামমোহন রায় বিভিন্ন উপাসক ও সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই পত্রে ধর্মবিষয়ে তাঁর উদারতা, সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাশীলতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

**ঙ) পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ (১৮২৩) :** বিদেশাগত এক খ্রিস্টান পাদরী ও তাঁর তিন চীনা শিষ্যের মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথন এই পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের রচনারীতি সরস ও আকর্ষণীয়।

**চ) ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (১৮২৬) :** মনু কথিত তিন-প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের মধ্যে রামমোহন রায় এই পুস্তিকায় শেষোক্ত গৃহস্থের লক্ষণ বিবৃত করেছেন।

**ছ) কায়স্থর সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার (১৮২৬) :** মদ্যপান সম্পর্কে রামমোহন রায় উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। মদ্যপান করলেও যে ধর্ম লোপ পায় না – এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে তিনি সেই মতই প্রকাশ করেছেন।

**জ) বজ্রসূচী (১৮২৭) :** মৃত্যুঞ্জয় আচার্যের বজ্রসূচী নামক গ্রন্থের প্রথম নির্ণয়কে রামমোহন রায় তাঁর এই পুস্তকে বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণ কাকে বলা যায়, তা এখানে আলোচিত হয়েছে। আলোচনান্তে লেখকের সিদ্ধান্ত – ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ, অন্য কেউ ব্রাহ্মণ নয়।

**ঝ) অনুষ্ঠান (১৮২৯) :** এই পুস্তিকায় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে বক্তব্য বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে।

**ঞ) গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩) :** বাঙালি রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ কোনটি এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। অকেনে মনে করেন শ্রীচৈত্যন্য মহাপ্রভু রচিত গৌড়ীয় ব্যাকরণই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ যদিও রামমোহন রায় রচিত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থখানিকে বাংলা ভাষায় বাঙালির লেখা প্রথম ব্যাকরণ বলে অনেকেই দীর্ঘদিন স্বীকৃতি দিয়ে আসছেন। ১৯৭০ সালে ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় একটি প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন, গ্রন্থটির নাম 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ'। এই গ্রন্থ সম্পর্কে পণ্ডিত মহলের অনুমান এটি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের দ্বারা ১৮০৭-১৮১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। পরবর্তীতে অধ্যাপক মনসুর মুসার একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ থেকে ধারণা করা যায় ড. মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ব্যাকরণ গ্রন্থটি উইলিয়াম কেরি রচিত ইংরেজি ভাষায় লেখা বাংলা ব্যাকরণের অনুবাদ।[১৮] তবে কে প্রথম বাংলা ব্যকরণের রচয়িতা সে বিতর্ককে দূরে রেখে বলা চলে বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ ব্যাকরণ গ্রন্থ অবশ্যই রামমোহন রায় রচিত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। এই গ্রন্থেই বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র স্বরূপ ও ব্যাকরণের ব্যাবহারিক তাৎপর্য যুগপৎ সুব্যবস্থিত ও সুপরিকল্পিত রূপে বর্ণিত হয়েছে। গৌড়ীয় জনপদের একটি সর্বজনীন ভাষা-ছন্দের বিশ্লেষণ ছিল তার মৌল পরিকল্পনাভুক্ত। ভূদেব চৌধুরী এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন-

> "প্রচলিত ভাষাকে রামমোহন কত খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং কত নিপুণভাবে তার বিশ্লেষণ করেছেন, সমগ্র ব্যাকরণ জুড়ে তার উদাহরণ অজস্র।"[১৯]

এই গ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায় ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়নের তাগিদ রামমোহন রায়ের লেখনীতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল। কার্যত ব্যাকরণ গ্রন্থ লিখতে বসে ব্যাকরণের আলম্বন ভাষাকে তিনি নবভাবে নির্মাণও করেছেন। এই গ্রন্থটি ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পেলেও এর রচনাকাল ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ। তবে তার আগে ১৮২৬ সালে তিনি এটি ইংরেজি ভাষাতে রচনা করেছিলে, পরবর্তীকালে তাকেই তিনি ভাষান্তরিত করেছিলেন। এই ব্যাকরণ গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বহুদিন হিন্দু কলেজের পাঠ্যপুস্তক রূপে প্রচলিত ছিল।

১৮১৫-১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ এই কালপর্বেই রামমোহন রায়ের যাবতীয় বাংলা পুস্তক রচিত হয়েছিল। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে সেসময় বাংলা সাধু গদ্যের কোনো সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত লেখ্যরূপ গড়ে ওঠেনি। তাঁর বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে শিক্ষার্থীর জন্য প্রণীত পুস্তকগুলির অধিকাংশ সংস্কৃতের পুচ্ছানুগ্রহীতার দোষে দুষ্ট ছিল। সেই প্রতিবেশে দাঁড়িয়ে সাবলীল গদ্যে এতগুলি রচনা রামমোহন রায়ের বিচিত্র ও ব্যাপক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। রামমোহন রায়ের গদ্যভাষা প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে -

> "দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।"[২০]

ঈশ্বর গুপ্তের এই মন্তব্য বহুলাংশে যথার্থ। রামমোহন রায়ের গদ্যে শব্দের পারিপাট্য রূপ ও তার মিষ্টতা সে অর্থে মেলে না, মেলার কথাও নয়। কারণ তিনি সচেতনভাবে কোনো সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, সাহিত্যের অন্যতম শর্ত 'রস' তাঁর রচনায় প্রায় অমিল। তবে কী তাঁর লেখনীকে সাহিত্য পদবাচ্য বলা যায় না? সিদ্ধান্ত টানার আগে আমাদের সাহিত্যের আরেকটি দিক জ্ঞানমূলক সাহিত্যের কথা ভাবতে হবে। সব লেখনির উদ্দেশ্যে কেবল রস উৎপাদন, তা কিন্তু নয়, জ্ঞান পরিবেশনও বহু রচনার ভিত্তি। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে সুললিত, সুমিষ্ট বাংলা গদ্য নয়; চিন্তনমূলক, যুক্তি ও ব্যাখ্যামূলক বাংলা গদ্যের জনক অবশ্যই রামমোহন রায়। আচারে মগ্ন বাঙালি জাতি যখন বেদ-উপনিষদাদি ভুলতে বসেছে, যেখানে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় শাস্ত্রচর্চাকে বাঁকা চোখে দেখা হচ্ছে; সেই তামসিক পরিবেশে বাংলা ভাষায় বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ চর্চার মধ্য দিয়ে জাতিকে তার ভাষা-ভিত্তির উপর দাঁড় করানো, বাংলা গদ্যের সঙ্গে পরিচয় করানোর গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছিলেন রামমোহন রায়। বাংলা ভাষায় বেদ-বেদান্ত চর্চার সূচনা তাঁর হাত ধরেই হয়েছিল এবং তাঁর রচনার ভাষা ছিল অনায়সবোধ্য। ঈশ্বর গুপ্ত সে কথা বলেছেন। এই যে ভাষার প্রাঞ্জলতা, সেকালের অন্যান্য রচনায় তা কার্যত দুর্লভ ছিল। দুর্ভাগ্যের হলেও কথাটি সত্য যে, সেকালে রচনারীতির এই প্রাঞ্জলতার জন্য রামমোহন রায় পণ্ডিতদের কাছ থেকে নিন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর রচনারীতিকে কটাক্ষ করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লিখেছিলেন -

> "আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বর অসতী নারীর সন্দর্শনে পারঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্করা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেই পরাঙ্মুখ হন।"

লৌকিক ভাষা অর্থাৎ দেশীয় বা বাংলা ভাষার প্রতি কীরূপ হীনমন্যতা এই পণ্ডিতবর্গের ছিল তা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের এই উক্তিতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। রামমোহন রায়ের কৃতিত্ব হল, তিনি বাংলা ভাষাতে শাস্ত্রের মতো গুরু গম্ভীর বিষয়ের ব্যাখ্যা এবং বাংলা ভাষাকে বিচার বিতর্কের ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে ভাষাকে কেবল অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন তা নয়; এরই পাশাপাশি তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সংস্কৃত ছেড়ে বাংলাতে লেখনি ধারণ করতেও বাধ্য করালেন। এই বিতর্ক-বিচারের আসরের মূল মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার অসামান্য পুষ্টি সাধিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে বাংলা গদ্য ভাষায় নিবন্ধ রচনার পথিকৃৎ হিসাবে রামমোহন রায়ের নামও সর্বজন বিদিত ও সর্বজন স্বীকৃত হয়ে যায়। এই বিষয়গুলি লক্ষ্য করে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী বলেছেন –

> "বুৎপত্তি এবং পরিণামী অর্থবিস্তারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আজ আমরা যুক্তি-বিচারের পারম্পর্যে 'প্রকৃষ্টরূপে বদ্ধ' মননশীল গদ্য রচনাকেই 'প্রবন্ধ' বলে গ্রহণ করে থাকি। রামমোহন নিঃসন্দেহে বাংলা গদ্যে অনুরূপ রচনাপ্রবাহের পথিকৃৎ। সেটুকুই আসল কথা নয়, বাংলা রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিষয় ও প্রকরণগত দুটি ধারার সূচনা করেছিলেন, নবজাগরণ যুগের বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য মূলত তারই অনুসরণে বিস্তার ও পরিণতি লাভ করেছে।"[২১]

অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আরও এক ধাপ এগিয়ে রামমোহনের গদ্য রচনার অকুণ্ঠ প্রশংসা করে লিখেছেন-

> "রামমোহন সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে অনুবাদ, আলোচনা, বিতর্ক ও মীমাংসার বাহন হিসেবে গড়ে তুললেন। কি করে বাংলা গদ্য লিখতে-পড়তে হয় তাও যেন বাঙালি জাতির হাত ধরে শেখালেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠি বাংলা গদ্যকে কাহিনী ও গালগল্প প্রকাশের বাহন করেছিলেন, আর রামমোহন তাকে যুক্তিতে, তর্কে, চিন্তায় সজ্জিত করে আধুনিক চিন্তাশীল মনের উপযোগী করে তুললেন। তাঁর গদ্য তাই ঋজুগতি, তীক্ষ্ণ ও যৌক্তিক পারম্পর্যে সুগঠিত। আধুনিক মনের জটিলতাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে আধুনিক ভাষা-বাহন প্রয়োজন – রামমোহন সেই আধুনিক ভাবপ্রকাশক বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টারূপে চিরদিন অম্লান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।"[২২]

এই মন্তব্যের মধ্যে কার্যত বাংলা গদ্যে রামমোহনের অবদান ও কৃতিত্ব সম্পর্কিত মূল্যায়ন সংক্ষিপ্ত ও সংহত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এই আলোচনা থেকে ধারণা করা যায় যে, সমাজ সংস্কার, সতীদাহপ্রথা রদ, আধুনিক শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, ধর্মতত্ত্বপ্রচার সহ সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নবচিন্তার উদ্রেক করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় কেবল এটুকুই নয়, বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও তিনিই নব যুগের প্রবর্তক। বাংলা গদ্যের আদি যুগে দাঁড়িয়েও কোনো লেখকের প্রথম রচনা যে এত সাবলীল, প্রাঞ্জল ও জড়তামুক্ত হতে পারে রামমোহন রায়ের 'বেদান্তগ্রন্থ' না দেখলে তা বোঝা সম্ভব নয়; তাঁর গদ্যরচনার সাবলীলতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর গদ্য আলোচনার বিষয় শাস্ত্রতত্ত্বের মতো গুরুগম্ভীর ও দুরূহ একটা ব্যাপার, যুক্তি-তর্কের মতো চিন্তাশীল ও শাণিত ভাষার ব্যবহার। এসব কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে, তাকে সর্বজনবোধ্য করে তোলার কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। অসীম সাহস ও আত্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করে সেই কঠোর ব্রত সাধনের মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্য ভাষাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব অবশ্যই রামমোহন রায়ের। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে বলেছিলেন –

> "এই শুষ্ক নির্জীব দেশে মুক্তির বাণী ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন এসেছেন। আমরা জোর করে তাঁকে অস্বীকার করতে চাই, কিন্তু সাধ্য কী তাঁকে অস্বীকার করি। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাঁর জীবনধারা দেখতে পাই। আমরা এখন ফল পাচ্ছি, তাই অনায়াসে গাছের গোড়ার কথা অস্বীকার করছি। রামমোহন আমাদের কাছে আত্মার মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছেন।"[২৩]

## তথ্যসূত্র ও মন্তব্য

১. দ্রষ্টব্যঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারত পথিক রামমোহন রায়, বিশ্বভারতী, ১৯৩৩, পৃষ্ঠা – ২৫।

২. দ্রষ্টব্যঃ জীবনীগ্রন্থগুলির পরিচয়ঃ

ক) নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, দে'জ পাবলিশিং।

খ) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রামমোহন, প্যাপিরাস।

গ) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (প্রথম খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৩. দ্রষ্টব্যঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, প্রথম খণ্ড, জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা – ৪০০

৪. দ্রষ্টব্যঃ তদেব, পৃষ্ঠা – ৪০৭, ৪০৮ ও ৪০৯।

৫. দ্রষ্টব্যঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রামমোহন, প্যাপিরাস, ষষ্ঠ সংস্করণ, জুলাই ২০১৬, পৃষ্টা – ১৯।

৬. এই সকল সাময়িক পত্রের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাময়িক পত্র' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) ও সন্দীপ দত্ত, বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিবৃত্ত, গাঙচিল (১৮১৮-১৮১৯)।

৭. দ্রষ্টব্যঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রামমোহন, প্যাপিরাস, ষষ্ঠ সংস্করণ, জুলাই ২০১৬, পৃষ্ঠা – ২৭।

৮. দ্রষ্টব্যঃ গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ ও অন্যান্য, জে এন ঘোষ এন্ড সন্স, নভেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠা – ৩৪।

৯. দ্রষ্টব্যঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃষ্ঠা – ৩৩।

১০. দ্রষ্টব্যঃ অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, রামমোহন-রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা – ৩৯।

১১. দ্রষ্টব্যঃ তদেব, পৃষ্ঠা – ৬৩।

১২. দ্রষ্টব্যঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা – ৩৩,৩৪।

১৩. দ্রষ্টব্যঃ অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত, রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, ভূমিকাংশ।

১৪. দ্রষ্টব্যঃ তদেব, পৃষ্ঠা – ১৫৮।

১৫. দ্রষ্টব্যঃ রাজা রামমোহন রায় (প্রণীত), রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী, প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা – ১৬৮।

১৬. দ্রষ্টব্যঃ রাজা রামমোহন রায় (প্রণীত), রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী, প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৭৬।

১৭. দ্রষ্টব্যঃ তদেব, পৃষ্ঠা – ২০৯।

১৮. দ্রষ্টব্যঃ বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণ ও রামমোহন, সাহিত্যশ্রী, পৃষ্ঠা – ৮৫-৮৭।

১৯. দ্রষ্টব্যঃ তদেব, পৃষ্ঠা – ৯৪।

২০. দ্রষ্টব্যঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, আনন্দ, ২০১৮, পৃষ্ঠা – ৩৩।

২১. দ্রষ্টব্যঃ ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণ ও রামমোহন, সাহিত্যশ্রী, ১৩৬৪, পৃষ্ঠা – ৭০।

২২. দ্রষ্টব্যঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ২০১৬-২০১৭, পৃষ্ঠা – ২৫৯।

২৩. দ্রষ্টব্যঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতপথিক রামমোহন রায়, বিশ্বভারতী, ১৯৩৩, পৃষ্ঠা – ৮৫।

---

লেখক পরিচিতিঃ ড. মোহিনী মোহন সরদার (ডি. লিট.), পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান। প্রাচীন ও মধ্যযুগের একনিষ্ঠ গবেষক ও প্রাবন্ধিক। কবিকঙ্কণ চণ্ডীঃ বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান, Three Episodes from the Old Bengali Poem Chandi, ভাদুগীতির ইতিকথা ও ভাদুগীতি সংগ্রহ ইত্যাদি গ্রন্থ, দুখে যাত্রা, বাংলা ছোটোগল্প প্রভৃতি একাধিক গ্রন্থের সম্পাদক ও বহু প্রবন্ধের রচয়িতা।